কালের কণ্ঠ

মঙ্গলবার, ২০ মে, ২০২৫

ঢাকা। মঙ্গলবার। ২০ মে ২০২৫। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২। ২১ জিলকদ ১৪৪৬ www.kalerkantho.com

সমাবর্তনে মায়ের সঙ্গে ধর্মরাজ তঞ্চংগ্যা ছবি : এখিং মারমা

এক জীবনে এত ঋণ শুধিব কেমনে

১৪ মে হয়ে গেল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন। সেখানে মাকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন **ধর্মচন্দ্র তঞ্চংগ্যা (ধর্মরাজ)**। জীবন মানে সংগ্রাম–এটি তাঁর চেয়ে ভালো কে বোঝে! জীবিকার তাগিদে কখনো রেঁস্তোরার থালা-বাসন মেজেছেন, কখনো হয়েছেন ওয়েটার। অনাথ আশ্রমে থেকে পড়েছেন। এখন তিনি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। রাঙামাটির রাজস্থলীর আমছড়াপাড়ার এই তরুণ জীবনযুদ্ধের গল্প শুনিয়েছেন **পিন্টু রঞ্জন অর্ক**কে

টানাটানির সংসারে জন্ম আমার। বাবা অতিন্দ্র তঞ্চংগ্যা দিনমজুর। মা চেয়েছিলেন আমি যেন ভালোভাবে পড়াশোনা করি, কিন্তু বাইরে গিয়ে পড়ার মতো টাকা ছিল না। বিশ্বজিত তঞ্চংগ্যা নামে এক বন্ধু থাকত ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে। ছুটিতে এলে সব সময় আশ্রমের গল্প করত। তখন অষ্টম শ্রেণিতে উঠলাম। বিশ্বজিত আমাকে ঢাকায় যাওয়ার রাস্তা বাতলে দিল। একটি বালিশ, নিজ হাতে বোনা কাঁথা, একটি বিছানা বস্তায় দিয়ে দিলেন মা। ২০০৭ সালের ৯ নভেম্বর প্রথমবারের মতো ঢাকার বাসে উঠলাম। গন্তব্য বাসাবোর ধর্মরাজিক অনাথালয়, যদিও আমি অনাথ নই। দারিদ্র্য আমাকে বাধ্য করেছে। সব শোনার পর কর্তৃপক্ষের মন গলল। ভর্তি হলাম ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়ে। তখন সেখানে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চলছিল। এক স্যার বললেন অংশ নিতে। গানে প্রাথমিক বাছাইয়ে প্রথম হলাম। সুমন বড়ুয়া স্যার ও রিমা বড়ুয়া ম্যাম আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এত দিন পর আমাদের স্কুলে একজন শিল্পী এলো।

কিন্তু সেই আনন্দ স্থায়ী হলো না। ফাইনালের আগে শ্রামণ হিসেবে দীক্ষা নিতে হলো। ফলে আর অংশ নেওয়া হলো না। কথা ছিল সাত দিন থাকব, কিন্তু এই সন্ন্যাসজীবন কাটাতে হলো তিন বছর। এভাবেই জিপিএ ৪.৭৫ পেয়ে এসএসসি পাস করলাম। ফরম ফিলাপসহ যাবতীয় খরচ দিয়েছেন বৌদ্ধ বিহারের প্রধান প্রয়াত শুদ্ধানন্দ মহাথের।

এত টাকা তো নেই

এর কিছুদিন পরেই সন্যাসজীবন ছাড়লাম। ২০১১ সালে নটর ডেম ও ঢাকা কলেজে পড়ার সুযোগ হলো। কিন্তু সুযোগ পেলেও নটর ডেম কলেজে পড়তে পারব কি না টেনশনে ছিলাম। কারণ অত খরচ কই পাব। তখন একদিন শ্রদ্ধানন্দ ভান্তে ডেকে বললেন, 'কিরে নটর ডেমে ভর্তি হবি না?' বললাম, না ভান্তে, এত টাকা তো নেই আমার। 'দূর পাগল, আমাকে বলবি না?' বলেই এক ভদ্রলোকের ভিজিটিং কার্ড দিলেন। বললেন, 'উনার কাছে যা, আমি ফোন করে দিচ্ছি।' সেই ভদ্রলোকের নাম প্রমথ বড়ুয়া। তিনি মিষ্টিমুখ করালেন। ফেরার পথে একটি খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভালো করে পড়বে।' পরে খুলে দেখি খামে পাঁচ হাজার টাকা। ভর্তির জন্য আরো প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দরকার। মা সোনা বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা পাঠালেন। সেতু বড়ুয়া দাদা আশ্রমের গেটে দাঁড়িয়ে আরো পাঁচ-ছয় হাজার টাকা জোগাড় করে দিলেন। দরকার ছিল ৯ হাজার টাকা। সেতুদাকে বললাম, চার-পাঁচ হাজার টাকা বেশি হয়ে গেছে। তিনি বললেন, 'ভালো দেখে দু-একটি শার্ট-প্যান্ট নিয়ো।' দুটি ছাইরঙা শার্ট কিনেছিলাম তখন।

বন্ধুর বাসায় থেকে পরীক্ষা

ভর্তির পরই আসলে শুরু হলো মূল লড়াই। মাসিক বেতন ৬০০ টাকা। সেটি আমার কাছে ছয় হাজার টাকার মতো ঠেকছিল। আমার বড় দাদা তখন গ্রামে কৃষি ব্যাংকে অফিস সহায়ক হিসেবে মাস্টাররোলে কাজ করতেন। এক হাজার ৫০০ থেকে এক হাজার ৬০০ টাকা পেতেন। তা থেকে আমাকে মাসে কখনো ৪০০ থেকে ৫০০, কখনো ২০০ টাকাও পাঠিয়েছেন।

মাস ছয়েক যেতেই বেতন দিতে পারছিলাম না। পরে জানলাম, কলেজে কাজের বিনিময়ে বেতন শোধের সুযোগ আছে। কাজ শুরু করলাম। এভাবে ছয় মাস কাজ করে বেতন দিয়েছি। দ্বিতীয় বর্ষে আবার সেই একই সমস্যা। নন্দিতা বড়ুয়া নামের এক দিদি থাকতেন বৌদ্ধ মন্দিরের কাছে। ঘটনাচক্রে একদিন তাঁর বাসায় গেলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমার পড়াশোনাসহ সব বিষয় শুনলেন। পরে সেই রাতে টিফিন বক্সে করে খাওয়ার জন্য খাবার দিলেন, সঙ্গে ৬০০ টাকা। বললেন, 'আরো যে কয় মাস বেতন লাগবে, আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে।' এইচএসসির মাস তিনেক আগে টাইফয়েডে আক্রান্ত হলাম। বন্ধু এহসান জীমের বাসায় থেকে পরীক্ষা দিলাম।

জুটছিল না খাবার

কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, কিন্তু বিধিবাম! দ্বিতীয়বার টাইফয়েডের ছোবলে নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম। ফলে সে বছর আর কোথাও ভর্তি হওয়া হলো না। বৌদ্ধ মন্দিরের পাশেই ছিল ইয়াং স্টার নামে একটি রেস্টুরেন্ট। সেখানে ডিশ ওয়াশিংয়ের কাজে যুক্ত হলাম। পরে রাজধানীর আরো কয়েকটি রেস্টুরেন্টে ওয়েটার হিসেবে কাজ করেছি। ২০১৪ সাল। তখন আমি যমুনা ফিউচার পার্কের এক্সটেসি ক্যাফেতে কর্মরত। ঢাকাসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিলাম। হলো না। শেষ সুযোগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগ। স্কুলজীবন থেকেই অভিনয় করতাম। তাই বিশ্বাস ছিল, সেখানে চান্স পাব। ভর্তি পরীক্ষায় ৪১তম হলাম।

প্রথম বর্ষে হলে ওঠার সুযোগ পেলাম না। নিরুপম তঞ্চংগ্যা নামে ক্যাম্পাসের এক বড় ভাইয়ের সাহায্যে উঠলাম প্যাগোডায়। মাসে সিটভাড়া ৬০০ টাকা, কিন্তু দিতে পারতাম না নিয়মিত। খাওয়ার টাকাও জুটছিল না। বাড়িতে যে চাইব, সে উপায়ও নেই। নাট্যকলায় পড়ার কারণে টিউশনিও মিলছিল না। সিটভাড়া দিতে পারছি না, ২০ টাকার টোকেন কিনে হলের ডাইনিংয়ে খাব, সেই টাকাও পকেটে নেই।

অতিন্দ্র তঞ্চংগ্যা ও নিতুরানী বড়ুয়া

> মামা, আমি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, পকেটে টাকা নেই। আমাকে অল্প ভাত দেওয়া যাবে? টাকা পেলে আপনাকে দিয়ে যাব

ভিডিও দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

সিদ্দিক মামার হোটেলে পাঁচ বছর

২০১৫ সালের এক দুপুর। ক্লাস শেষে কলা ভবনের সামনে ঝুপড়িতে গেলাম। পকেটে এক পয়সাও নেই। পেটে যেন ক্ষুধার আগুন লেগেছে। লাজশরমের মাথা খেয়ে সিদ্দিক ভাত ঘরের সিদ্দিক মামার কাছে গিয়ে বললাম, 'মামা, আমি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, পকেটে টাকা নেই। আমাকে অল্প ভাত দেওয়া যাবে? টাকা পেলে আপনাকে দিয়ে যাব।' তিনি বললেন, 'যখন টাকা আসে দিয়েন, খান এইখানে।' সেই থেকে এই মানুষটির হোটেলে বাকির খাতা খুলে খেয়েছি টানা প্রায় পাঁচ বছর।

আমার আরেক মা

অনটনে পড়াশোনায় ভাটা পড়ল। প্রথম বর্ষের ব্যাচের সর্বনিম্ন সিজিপিএ ২.৬৭ পেলাম। অভাব থেকে মুক্তির অনেক রাস্তা খুঁজলাম। দ্বিতীয় বর্ষে একটি সামাজিক কাজ করতে গিয়ে পরিচয় হলো সিঙ্গাপুরের নাগরিক বেন চেওংয়ের সঙ্গে। 'ম্যাজিক্যাল লাইট সিঙ্গাপুর' নামে একটি চ্যারিটি ফান্ড চালান তিনি। নিজের সমস্যা তুলে ধরে একদিন তাঁকে এসএমএস করলাম। তিনি নিরাশ করলেন না। কিছুদিন পর বাংলাদেশে এলেন। চট্টগ্রামে দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। বললেন, 'তোমার কাছে একটিই চাওয়া–সুযোগ পেলে মানুষকে সহযোগিতা করবে।' ছয় হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মাস্টার্স পর্যন্ত তোমার খরচ চালাব।' উনার সঙ্গে যোগাযোগে সহায়তা করেছিলেন গ্রামের শিক্ষক উজ্জল তঞ্চংগ্যা। সেই থেকে আমার খরচ চালিয়েছেন বেন। করোনার সময় মাস ছয়েক ম্যাজিক্যাল লাইট ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে হতদরিদ্র মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করেছেন। তাঁর হয়ে কাজটি আমিই করেছিলাম। প্রতিষ্ঠানটিতে আমার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লিলি কো নামে এক ভদ্রমহিলা। তাঁকে মা বলে ডাকি। সিজিপিএ ৩.৩০ পেয়ে স্নাতক সম্পন্ন করলাম। স্নাতকোত্তর করলাম অভিনয়ের ওপর। প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ হলাম।

মা-বাবার ছায়া হব

অধ্যাপক ড. কুন্তল বড়ুয়া, অসীম দাশ, প্রকাশ দাশগুপ্ত, শামীম হাসান স্যারসহ এ পর্যন্ত অনেক মানুষের আদর-ভালোবাসা পেয়েছি। সিদ্দিক মামা না থাকলে হয়তো ক্ষুধার জ্বালায় মরতে হতো। এ জীবনে তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারব না। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছে হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনালে। বছর দুয়েক ছিলাম সেখানে। কিছুদিন আগে সিনিয়র কমিউনিকেশনস অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে।

১৪ মে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন হলো আমাদের। মা নিতুরানী বড়ুয়া শুধু নিজের নামটিই লিখতে পারেন। অনেক কষ্টে আমাদের দুই ভাইকে পড়িয়েছেন। চেয়েছিলাম কালো গাউন আর টুপিটি আগে তাঁকেই পরাব। এটি পরার পর দেখলাম, মায়ের চোখেমুখে যেন আসমান সমান সুখ। বাকি পথ মা-বাবার পাশে ছায়া হয়ে থাকতে চাই। এখন সাধ্যমতো মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। ভবিষ্যতে এটা আরো বড় পরিসরে করতে চাই।